International Journal of Applied Research 2019; 5(7): 211-214

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(7): 211-214
www.allresearchjournal.com
Received: 04-05-2019
Accepted: 09-06-2019

বিকাশ সরদার
23 Lake East 6th Road,
Shantoshpur Mini Bus Stand,
Kolkata, West Bengal, India

Correspondence
বিকাশ সরদার
23 Lake East 6th road,
Shantoshpur Mini Bus Stand,
Kolkata, West Bengal, India

বাংলায় রচিত সাংস্কৃত গ্রন্থগুলির অনুবাদ ও বিশ্লেষণের পরম্পরা

বিকাশ সরদার

তুর্কি আক্রমনের পরবর্তী সময় থেকেই বাংলায় আনুবাদ সাহিতের সূত্রপাত বলে পাণ্ডিতগণ মনে করেন। আবশ্য এর আগেও আনুবাদ হয়েছে তবে তা প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল। তুর্কি আক্রমনের ফলে বাঙালির রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন পারিবর্তন ঘটেছে তেমনি তার ধর্ম-সংস্কৃতি ও সমাজের ক্ষেত্রেও পারিবর্তন লক্ষ্যকরা যায়। সব অর্থে বিপন্ন বাঙালি যখন স্বধর্মচ্যুত হয়েছিল বিশেষকরে তার সংস্কৃতির আভিজ্ঞান, তখন সে এমন একটি শক্তিশালী বলয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল যার আশ্রয়ে সে নিজের সত্তাকে রক্ষা করতে পারবে। এইরকম সংকটজনক অবস্থার পারিপ্রেক্ষিতে বাংলার মাঙ্গলকাব্যগুলো যেমন 'সাংস্কৃতিক যোদ্ধা' হিসাবে ভূমিষ্ট হয়েছে তেমনি আনুবাদ সাহিত্যগুলিও কালের সমস্যা সমাধানে কার্যকারী ভূমিকা নেয়।

আজকের এই বাংলা আনুবাদ সাহিত্যের উন্নতি দেখে প্রথাম অবাস্থার কথা কল্পনা করা যায় না।প্রথম আবস্থায় এই আনুবাদ সাহিত্য প্রকটিত হয় পালাগানের মধ্যদিয়ে তা আনেক পাণ্ডিত মনেকরেন।বাঙালির মন চিরকাল আধ্যাত্মমুখী, কিন্তু তাদের সেই আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রধান অন্তরায় সংস্কৃত ভাষার দুর্বোধ্যতা। বলাবাহুল্য এই সময় শিক্ষাও উচ্চ-উভিজাতদের মধ্যে খাচাবন্দি হয়েছিল, ফলে শাস্ত্র চর্চা থেকে সাধারান মানুষ বঞ্চিত থেকে যেত, এইসব মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে পালাগায়করা বা কথকরা আবির্ভূত হন।যা কিনা দেবভাষার ঘেরাটপে বন্দি ছিল তা পালাগায়কদের কল্যাণে গ্রামীন আশিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রসারিত হল দেশিয় ভাষার বাহনে।

এবার আসা যাক ভাষার প্রকারের কথায়। ডঃ সুকুমার সেন মনেকরেন যে দেশীয় সাহিত্যের দুটি ভাগ ছিল।একটি আবহমানকাল ধরে চলে আসা লোকসাহিত্যের ধারা,যাকে নীতি,ছড়া ও রুপকথা বিষয়ানুসারে ভাগ করা যায়। আন্যটি শিক্ষিত মানুষের আনুশীলিত সাহিত্য।এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

"এ প্রবাহের উৎপত্তি সংস্কৃতে এবং পুষ্টি সংস্কৃত শিক্ষিতের দ্বারা, ধর্মারম্ভের অথবা রাজসভার আশ্রয়ে পূর্বভারতে তুর্কি অভিজানের প্রাক্কালে রাজসভায় যে সাহিত্যের বহমান হইয়ছিল তাহার সারবস্তু পুরাণ হইতে নেওয়া এবং তাহার নির্মানরীতি সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়াবহ। তুর্কি আক্রমণে স্বাধীন রাজসভা ভাঙিয়া য়াওয়ায় এই দ্বিতীয় প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়। তাহার পর দিল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হইয়া আবার যখন দেশের রাজাদরবারে হিন্দু সামন্ত-সেনাপতি-মন্ত্রিদের সহযোগে জাঁকাহয়া উঠিল তখন হইতে ধীরে ধীরে লোকলোচনে সে প্রবাহের পুনরাবির্ভাব ঘটিতে লাগিল"। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ২০৬)

পণ্ডিত সুকুমার সেন মনেকরেন মঙ্গলকাব্যগুলি প্রাচীন রূপকথারই বিবর্তিত রূপ ও শিক্ষিত মানুষের ধর্ম অনুশীলনের ফল অনুবাদ সাহিত্য।বহু পণ্ডিতগণ মনেকরেন চতুর্দশ শতকে মালাধর বসু থেকেই অনুবাদ সাহিত্যের সূত্রপাত।১৫৪৪ খ্রীঃ কামতা-রাজ সমরসিংহের রাজসভায় 'নল-দময়ন্তী'র যে কাব্য লিখিত হয়েছিল তাতে যেমন রাজার পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় পাই, তেমনি অনুবাদের কারণটি আমরা জানতে পারি। তাহল সংস্কৃত ভাষা যে বাঙালির নিজস্বভাষা-নিজস্বচিন্তার বাহক হতে পারেনি তা বোঝা যায় এবং অনুবাদে কোন তাত্বিকতা প্রকাশ পায়নি, পেয়েছে সংস্কৃতির গুরুগম্ভীর ভাবের সরলকৃত করে সাধারণ মানুষের পঠনোপযোগী করে তোলার প্রয়াস।

আনেকে মনেকরেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ হতে থাকে। রামায়ণ অনুবাদের সূচনা হয়েছিল কৃত্তিবাস ওঝার হাত ধরে। ইনি পঞ্চদশ শতকের কবি ছিলেন, তবে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে।তিনি বাল্মীকি রামায়ণকে পুরোপুরি অনুবাদ করেননি কিছু কিছু জায়গাতে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন।

তাঁর লেখনীর যাদুস্পর্শে রামায়ণের চরিত্রগুলি এতটাই সজীবন্ত যে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হলেও আজোও কোটিপতির প্রসাদ থেকে দীনদরিদ্রের পূর্ণ-কুটিরে বিদ্যমান। কৃত্তিবাস রামায়ণের অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালির স্নিগ্ধ, মধুর জীবনদর্শনকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন।

কৃত্তিবাসের পরে অনেকে রামায়ণ রচনা করেন তন্মধ্যে 'অনন্ত রামায়ণ' প্রাচীন বলে মনে হয় কারণ এটি বল্কলে লিখিত। শ্রীযুক্ত করুণাময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তকটি সংগ্রহ করেন তবে এর রচয়িতা এবং সময় কাল জানা যায় না। এছাড়া আমরা দ্বিজ-দুর্গারাম প্রণীত রামায়ণ এবং ১৬৬৪ খ্রীঃ দ্বিজ মধুকণ্ঠে অনুবাদিত রামায়ণ পাওয়া যায়। এঁরা সকলে বাল্মীকি রামায়ণকে পুরোপুরি অনুসরণ করেননি।

রামায়ণ অনুবাদের দ্বিতীয়পর্যায় হল সপ্তদশ শতক। এই সময়ে রামায়ণ অনুবাদের অনেক কবি পাওয়া যায় যাঁরা প্রায়শই বাল্মীকিকে এড়িয়ে গিয়ে নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ পাঁচালীর আকারে রামায়ণ পরিবেশন করেন। এই সময় দ্বিজ-হরিদাস পাঁচালী রচনা করেন। পূর্ববঙ্গের নিত্যানন্দ আচার্য্য 'অদ্ভুত আচার্য্য' আখ্যায় প্রাপ্ত হয়ে ১৭৬৪ খ্রীঃ রামায়ণ অনুবাদ করেন। বুদ্ধদেব উপাধীধারী রামানন্দ ঘোষ ১৭৭৯ খ্রীঃ সমগ্র রামায়ণের অনুবাদ করেন। পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ সিংহ ভূপের আদেশে জগৎরাম রায় রামায়ণ অনুবাদ করেন ১৭৯০ খ্রীঃ। দ্বিজ ভবানী শঙ্কর নামে একব্যক্তির রামায়ণের আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিস্কিন্ধ্যা ও সুন্দরকাণ্ড পাওয়া গিয়েছে, সম্ভবতঃ ইনি সমস্ত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রণয়ন করেছিলেন।

এই সময় আমরা আরো অনুবাদকের নাম পাই যাঁরা কেউ বাল্মীকি রামায়ণের দ্বারস্থ হননি, এঁরা আধ্যাত্ম ও অদ্ভুত-রামায়ণ থেকে বেশি আনুবাদ করেছিলেন যেমন-দ্বিজ গঙ্গারামের 'রাম্লীলা', ঘনশ্যাম দাসের 'সীতার বনবাস'। এই সময় 'গুণরাজ' উপাধীযুক্ত একজন কবি মহাভারতের বনপর্বকে আশ্রয় করে তৈরী করলেন 'ভারত রামায়ণ'। এই সময় আমরা চন্দ্রাবতী নামে এক মহিলা অনুবাদকের নাম পায় যিনি রামায়ণের সীতা চরিত্রের উপর বেশি জোর দেন তাই তাঁর অনুবাদের নাম 'সীতায়ণ'।

আঠারো শতকেও আমরা অনেক অনুবাদকের নাম পাই তাঁরা হলেন- দ্বিজ কল্যানচন্দ্র, দ্বিজ রঘুরাম, দেবীনন্দন, শ্রীনাথ দ্বিজ, সারদানন্দ, শতানন্দ এঁরা প্রত্যেকে রামায়ণের খণ্ড অনুবাদে অগ্রসর হয়েছেন। এছাড়া রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একব্যক্তি ১৮৩৮ খ্রীঃ পিতা বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদেশে নদীয়া জেলার গঙ্গার পূর্বতীরস্থ মেটের গ্রামে বসে তিনি রামায়ণ অনুবাদ করেন।

রামায়ণের মতো মহাভারতও সারা ভারতবাসীর জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। রামায়ণের মতো মহাভারতের অনুবাদ সেই প্রাচীন কাল ধরে হয়ে আসছে। ড. দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে সুলতান নুসরত খান ১২৮৫ থেকে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে মহর্ষি বেদব্যাস রচিত মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন। যা 'ভারতপাঞ্চালী' নামে খ্যাত ছিল। যদিও সেই মহাভারতের সম্পর্কে বিশদ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এটাও এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নয় যে সেই অনুবাদটি সমগ্র ছিল অথবা অংশবিশেষ। 'ভারতপাঞ্চালী'র কর্তা কে ছিলেন? তবে কবি পরমেশ্বর তার বাংলা মহাভারতে বলেছেন যে, সুলতান নুসরত খান 'ভারতপাঞ্চালী' রচনা করেছেন। নাসিরুদ্দিন নুসরত সাহ তাঁর বাবা সুলতান হোসেন সাহের শাসন কালে (১৪৯৩-১৫১৭) জেনরেল পরাগল খানের সঙ্গে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কবীন্দ্র পরমেশ্বর অনূদীত মহাভারত পেয়েছিলেন যা 'পরাগলি মহাভারত' নামে বিখ্যাত। সেই পরাগলি মহাভারতে 'ভারতপাঞ্চালী'র কথা উল্লেখ ছিল এমন ঐতিহাসিকরা মনে করেন। পরাগলি খানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ছুটিখানের আদেশ শ্রীকরণ নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বটি অনুবাদ করেন। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে কবি সঞ্জয় প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমগ্র মহাভারতের বাংলায় অনুবাদ করে ছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে আমরা অনেক অনুবাদকের নাম পাই যাঁরা কেউই সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেননি। এঁরা প্রত্যেক মহাভারতের একটি বা দুটি পর্বের অনুবাদ করেছেন ও নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন- দেবকীনন্দনের নামে কর্ণপর্ব, দ্বিজ অভিরামের অশ্বমেধ পর্ব, কৃষ্ণানন্দবসুর শান্তিপর্ব এটি ১০৯৯ সনের লেখা একটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। অনন্ত মিশ্রের জৈমিনি ভারত এটি অশ্বমেধ পর্বের উপর লেখা। রঘুনাথ, হরিদাস এবং দ্বিজ রামচন্দ্র খান অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে আমরা নিত্যানন্দ ঘোষ নামে একজন অনুবাদকের নাম পাই, যিনি মহাভারতের করুণ ও বীররসের বর্ণনায় কাশিরাম দাসকেও ছাপিয়ে গেছেন। তবে রামায়ণের অনুবাদক হিসাবে যেমন কৃত্তিবাস ওঝার কথা স্মরণ করি তেমনি মহাভারতের অনুবাদক হিসাবে কাশীরাম দাসের অনুবাদই বাঙালির ঘরে ঘরে আজও পূজিত হচ্ছে। কাশিরাম দাস আনুমানিক একাদশ খ্রীষ্টাব্দ সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন। এছাড়াও তিনি আরো তিনখানি কাব্য রচনা করেন তাহল- স্বপ্নপর্ব, জলপর্ব ও নালোপাখ্যান। এই সময় কাশিরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস' এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর 'জগন্নাথমঙ্গল' রচনা করেন।

এছাড়া আমরা আরোও কয়েকজন অনুবাদকের নাম পায় যাঁরা সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেননি কেবলমাত্র কয়েকটি পর্বের অনুবাদ করেছেন। যেমন কাশিরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস ১৫০০ শ্লোকে মহাভারতের দ্রোণপর্বটি অনুবাদ করেছিলেন ১১৬২ সনে। উৎকল কবি সায়ণ মহাভারতের আদি, সভা ও বিরাটপর্বের অনুবাদ করেন। গঙ্গাদাস সেন আদি ও অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন, রাজেন্দ্র দাসের আদি পর্বের অনুবাদ, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্বের অনুবাদ, দ্বৈপায়ন দাসের দ্রোণপর্বের অনুবাদ এবং দ্বিজ রামকৃষ্ণদাস ও ভারত পণ্ডিতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য এছাড়া আরো অনেকের অনুবাদ আছে।

১৮৫৭ খ্রীঃ কালিপ্রসন্ন সিংহ মহর্ষি বেদব্যাস রচিত মহাভারতের গদ্যাকারে অনুবাদ করেন। এবং সেই বছরেই মহাকবি কালিদাস রচিত 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের অনুবাদ করেন, আবার ১৮৫৯ খ্রীঃ 'মালতী-মাধব' নাটকের অনুবাদ করেন।

রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ আমরা যেমন পাই তেমনি আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতপুরাণেরও অনুবাদ পাই বাংলায় ভাগবতের সার্থক অনুবাদ করেন মালাধর বসু। তিনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধকে অনুবাদ করে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন, এই গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি তিনি ১৪৭৩ খ্রীঃ সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহের সভায় বসে এই অনুবাদ করেছিলেন মূলত লোকশিক্ষার জন্য।

এরপর আমরা চৈতন্য পরবর্তী কিছু ভাগবত অনুবাদকে পাই। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভাগবতাচার্য রঘুনাথ পণ্ডিত যিনি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বভাগে ভাগবতের সারানুবাদ

করেছিলেন। এছাড়া আমরা মাধবাচার্যের নাম পাই যিনি ভাগবতপুরাণের দশম স্কন্ধের অনুবাদ করেছেন নিজের কল্পনার রঙ মিশিয়ে। সনাতন চক্রবর্তী নামে আরো একজন ভাগবত অনুবাদকের নাম পায় যিনি ২০ বছর ধরে সম্পূর্ণ ভাগবতের অনুবাদ করেন। এছাড়া আমরা কৃষ্ণদাস নামধারী তিনজন অনুবাদকের নাম পাই। প্রথম কৃষ্ণদাসের অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। দ্বিতীয় কৃষ্ণদাসের অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' এবং তৃতীয় কৃষ্ণদাসের অনুবাদের নাম 'গোবিন্দবিজয়'।

আমরা সংস্কৃত গ্রন্থগুলির বাংলায় অনুবাদের কারণ হিসাবে দেখতে পেলাম বাঙালি তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রচেষ্টা, কিন্তু ধর্মপরায়ণ বাঙালি কেবলমাত্র রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতপুরাণের অনুবাদ করে তার সংস্কৃতি বলয়কে মজবুত করা যাবে এই রকম না ভেবে, তাদের নিজেদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বলয়কে সুদৃঢ় করার জন্য অনুবাদ করেছিলেন বিভিন্ন পুরাণ ও ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্যের। যেমন আমরা প্রথমেই পায় ভক্তিবাদী অনন্ত কদলীকে যিনি ষোড়শ শতাব্দীতে কুচবিহারের গীতা ও গীতগোবিন্দের অনুবাদ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী 'রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব' কে অনুবাদ করে 'বিদগ্ধমাধব' নামক নাটক লিখলেন। এছাড়া তিনি 'দানকেলিকৌমুদী'র অনুবাদ করে 'দানলীলাচন্দ্রামৃত' নামে গ্রন্থ লেখেন।

অষ্টাদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই কুচবিহারের রাজসভায় রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষায় দশটি পুরাণের অনুবাদ হয়েছিল। এগুলি হল- মহীনাথের মার্কন্ডেয় পুরাণে মাতা চণ্ডীর অনুবাদ। বিপুজ্ঞয় ও রঘুরামের পদ্মপুরাণের অনুবাদ, রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মোত্তর খণ্ড ও বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের অনুবাদ করেন। মাধবাচার্য্যের বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ এবং দ্বিজ-রামের ধর্মপুরাণের অনুবাদ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ বিদ্যাসাগর পর্যন্ত আমরা যদি দেখি তাহলে মূলত দুটি দিক আমাদের সামনে এসে পড়ে। প্রথমত শাসক শক্তিরা নিজেদের শাসনের জন্য আইন-কানুন ও পাঠ্যগ্রন্থের অনুবাদ এবং ধর্মপ্রচারের জন্য ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ এবং সেই সঙ্গে বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করে শিক্ষিত বাঙালির বুদ্ধির বিকাশ ঘটানো।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮০০ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ইংরেজ শাসকদের আইনি সুবিধার জন্য স্থাপিত হলেও পরে এর কর্ম-কাণ্ডের ব্যাপকতা নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই কলেজের প্রধান শিক্ষক কেরি যিনি সাহিত্যের অনুবাদে ও মৌলিক রচনায় প্রভূত উৎসাহ দান করেন। এই কলেজে কেরির দুই সহকারি শিক্ষক রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নানাভাবে অনুবাদ করেছেন। যেমন রামরাম বসু ১৮০১ খ্রীঃ অনুবাদ করেন 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র', মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' ১৮০২ খ্রীঃ অনুবাদিত হয়। এছাড়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ১৮১৩ খ্রীঃ অনুবাদিত হয়। তাছাড়া আরো কয়েকজনের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- গোপালনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' ১৮০২ খ্রীঃ অনুবাদিত হয়। রামকিশোর তর্কচূড়ামণির 'হিতোপদেশ' ১৮০৮ খ্রীঃ অনুবাদিত হয় এবং হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' ১৮১৫ খ্রীঃ অনুবাদিত হয় এছাড়া আরো অনেকের অনুবাদ গ্রন্থ আছে।

রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত এঁরা সবাই অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা গদ্যসাহিত্যের যেমন নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তেমনি অনুবাদের মাধ্যমে সমাজসংস্কার, মৌলিক সাহিত্য ও বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছিলেন যা কিনা পরবর্তীতে বিরাটরূপ ধারণ করে।

রামমোহন রায় এর নাম সবার আগে উচ্চারিত হয়, তিনি অনুবাদকে মূলত সমাজসংস্কার ও নিজের মত প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ঈশ, কেন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদের অনুবাদ করেন এছাড়াও তিনি গীতার পদ্যও অনুবাদ করেন। 'বৈদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' নামে দুটি গ্রন্থও তিনি অনুবাদ করেন।

এই সময়কার শিক্ষিত বাঙালির বিশ্বসাহিত্যের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন ও অনুবাদের মধ্য দিয়েই তা মেটাতে চেয়েছিলেন। এই কাজ প্রথম সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের হাত ধরে। বিদ্যাসাগর যে সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন সেগুলি হল- ১৮৪৭ খ্রীঃ বিদ্যাসাগর শিবদাস কর্তৃক 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' অনুবাদ করেন। মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'- এর অনুবাদ করেন ১৮৫৪ খ্রীঃ 'শকুন্তলা' নামে। ১৮৬০ খ্রীঃ 'সীতার বনবাস' অনুবাদ করেন। মহাভারতের উপক্রমণিক অংশটি তিনি অনুবাদ করেন। এছাড়া তিনি আরো অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। বিদ্যাসাগরের অনুবাদ গ্রন্থগুলি বাংলা গদ্যসাহিত্যকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে আমরা আরো একজনের নাম পাই যাঁর হাত ধরে বাংলা কাব্য অনুবাদধারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। তিনি হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিনি নাট্যকার হিসাবে কিন্তু তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিকাংশ অনুবাদ আখ্যায়িকাধর্মী, নাট্যকাহিনীর মতো তার বিন্যাস।

এই সময়ের আলোচনা রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেক করা সম্ভব নয়। কেননা তিনি সবার কাছে আধুনিক। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্য থেকে সরাসরি অনুবাদ করেননি, আসলে অনুবাদের সার্থকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে সংশয় ছিল। তবে পরে তিনি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ না করলেও অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। যেমন- 'তীর্থযাত্রী' ১৩৩৯ সনে অনুবাদ করেন। চীনা কবি নি-পো-এর চারটি কবিতার অনুবাদও তিনি করেন।

সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদের পরম্পরা প্রাচীনকাল থেকেই আজও চলে আসছে। প্রাচীনকালে অনুবাদ সমাজ পুনর্গঠনের ও ধর্মীয় রক্ষার প্রাথমিক চাহিদা থেকে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের সূত্রপাত হলেও পরবর্তীকালে এই অনুবাদ দেখা দিচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিশ্বসাহিত্যের সূত্রে বাঁধার চেষ্টা। বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বে বা আধুনিকতা আনতে অনুবাদের প্রয়োজন হয়েছিল। একই সঙ্গে বাঙালির জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থতার প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী

1. সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৫০

2. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ‘কথামালা’, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, পাত্রজ পাবলিকেশন, অখণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১
3. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’, প্রথমখণ্ড, কলকাতা মডার্ন বুক প্রাঃ লিঃ ১৯৫০
4. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘রামায়ণ’, প্রাচীন সাহিত্য, কলকাতা, বিশ্বভারতী ১৩১৪
5. শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ কলিকাতা ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯২৭
6. সুখময় মুখোপাধ্যায়, ‘কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত রামায়ণ’, কলিকাতা, ভারবি তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৭